২১ বর্ষ : ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ২০১২

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

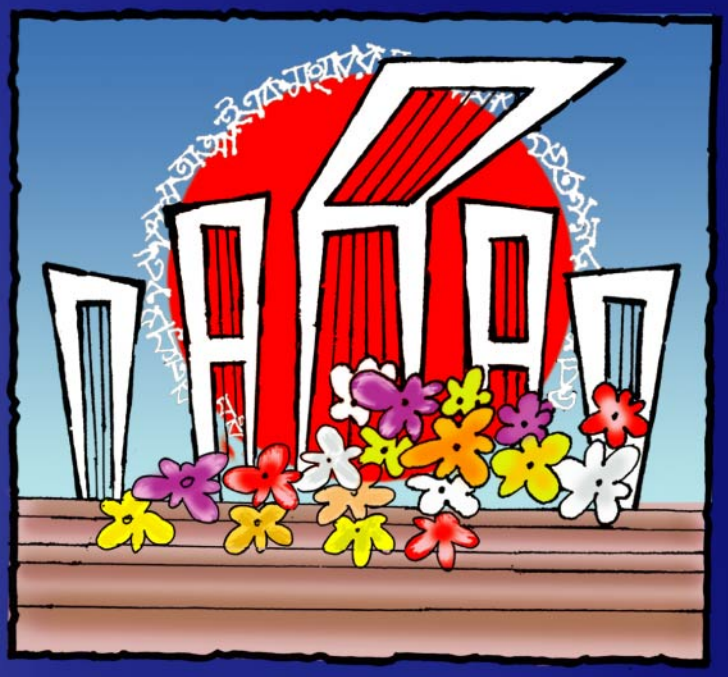

ভাষা দিবসের গৌরব বাড়াবো
দেশের নারী-পুরুষ সবাই সাক্ষর হবো

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকীয়

আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের ভাষা। আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মতো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে নানান জাতির মানুষ। নানান রকম তাদের ভাষা। কিন্তু বাঙালি একমাত্র জাতি, যারা ভাষা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছে। তাইতো বাঙালিদের এই ত্যাগের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে জাতিসংঘ। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে। এখন ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দুনিয়ায় পালিত হয় 'মাতৃভাষা দিবস'।

কিন্তু এই সম্মান আমরা নিজেরা রক্ষা করতে পারছি কোথায়? আমাদের দেশে বাঙালি ছাড়াও বাস করে প্রায় ৪৫ টি ভিন্ন ভাষার মানুষ। কিন্তু স্বাধীন দেশে বাস করে এখনও তারা নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারছে না। ফলে এসব ভিন্ন ভাষার শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। তাই বিষয়টি নিয়ে এখনই আমাদের ভাবা দরকার। অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পাশাপাশি মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার সুযোগ থাকা দরকার। তাহলে দেশের সকল এলাকার সকল মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাবে। বাড়বে দেশের শিক্ষার হার।

আলাপ

২১ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০১২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড.এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
এম.এ. রশীদ
দেওয়ান ছোহরাব উদ্দীন
মোহাম্মদ মহসীন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
এম. এ. মান্নান
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

কোন পাতায় কী আছে

- মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ১-২
- বিপ্লবী এক নারীর গল্প ৩-৫
- কথামালা ৬
- আমাদের পাতা ৭
- গাওতা: চাষাবাদের কৌশল ৮-৯
- পাঠকের পাতা ১০-১১
- জিডি বা সাধারণ ডায়েরি ১২-১৩
- ধাঁধা ১৪

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সিয়েরা লিওনের সরকারি ভাষা বাংলা

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমাদের সরকারি ভাষা হলো বাংলা। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। এজন্য আমাদের অনেক রক্ত ঝরেছে। শহীদ হয়েছেন অনেক ভাই। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের কয়েকটি এলাকার মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে।

কিছুদিন আগে একটি দেশ বাংলাকে তাদের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়। দেশটির নাম হলো- 'সিয়েরা লিওন'। অথচ কয়েক বছর আগেও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। ভিন দেশে সরকারি ভাষা হিসেবে 'বাংলা ভাষা' এই প্রথম স্বীকৃতি পায়।

দেশটি কোথায় অবস্থিত

'সিয়েরা লিওন' নামের দেশটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত। দেশটির সরকারি নাম 'সিয়েরা লিওন প্রজাতন্ত্র'। 'সিয়েরা লিওন' নামের অর্থ হলো 'সিংহ পর্বত'। দেশটির আয়তন ৭১ হাজার ৭৪০ বর্গকিলোমিটার। এই দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ।

সিয়েরা লিওনের ভাষা

'সিয়েরা লিওন'-এ বাস করে প্রায় ১৬টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। তাদের সবারই নিজস্ব ভাষা আছে। 'সিয়েরা লিওনে'র সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি। এখানে আরও প্রায় ২০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে 'মেন্দে ভাষা' ও 'তেমনে ভাষা' উল্লেখযোগ্য। তবে দেশের কিছু মানুষ 'ক্রিও' নামের ভাষায় কথা বলে। এটি একটি মিলিত ভাষা। ইংরেজির সঙ্গে স্থানীয় ভাষাগুলো মিলে এই 'ক্রিও' ভাষার জন্ম হয়েছে। এখন সেখানে নতুন করে যোগ হয়েছে 'বাংলা ভাষা'।

বাঙালি ও বাংলা ভাষার পরিচয়

বাঙালি ও বাংলা ভাষার সাথে পরিচয় হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি আমাদের জানা দরকার। ১৯৬১ সালের ২৭ এপ্রিল 'সিয়েরা লিওন' স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার চার বছর পার হতে না হতেই দেশটিতে দেখা দেয় নানা রকম সমস্যা। সেখানে দেখা দেয় নানান ধরনের অরাজকতা। এক সময় তারা নিজেদের মধ্যে কলহে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৯১ সালের দিকে এই কলহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দীর্ঘ ১০-বছর ধরে কলহ চলে। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলো এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তখন জাতিসংঘ এগিয়ে আসে। জাতিসংঘ ১৯৯৯ সালে সিয়েরা লিওনে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেয়। জাতিসংঘের সহায়তায় ২০০২ সালে এই দেশের কলহ শেষ হয়। বাংলাদেশসহ ৩১টি দেশ জাতিসংঘের এই শান্তি মিশনে যোগ দেয়।

বাংলাদেশ যেভাবে সহায়তা করে

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকটি দল, কয়েক দফায় সিয়েরা লিওনে যায়। তারা সেখানে তাদের নিয়মিত কাজের পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। দেশবাসীর মনে আস্থা ও নিরাপত্তা আনার চেষ্টা করে। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সাধারণ সেনারা সেখানে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। অনেকে আবার ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও ব্যবহার করতে থাকে।

কিন্তু স্থানীয় লোকজনের কাছে বাংলা ভাষা ছিল অপরিচিত। বাঙালি সেনারা তাই তাদের বাংলা ভাষা শেখাতে শুরু করে। তারাও ভাষাকে গ্রহণ করে খুব আগ্রহের সঙ্গে। এক সময় দেখা যায়, স্থানীয় লোকজন বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারছে। এই ভাষা শিখে নেয়ার ফলে বাঙালি সেনাদের পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। ঠিক একই ভাবে তারা বাঙালি রীতিনীতির সাথেও পরিচিত হতে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারাও বাঙালি নাচ ও গান পরিবেশন করা শুরু করে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সভায় বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে তারা। এভাবে এক সময় বাংলা ভাষা সেখানে জনপ্রিয়তা পায়।

বাঙালিদের অবদানের স্বীকৃতি

সিয়েরা লিওনের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাঙালি সেনারা বড় ধরনের অবদান রাখে। বাঙালি সেনাদের এই অবদানের স্বীকৃতি দেন তারা। বাংলা ভাষাকে সিয়েরা লিওনের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। এটা হয় ২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর। ঘোষণাটি দেন সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট আহমেদ তেজান কাব্বা। তিনি বাংলাদেশ সেনাদলের নির্মিত ৫৪ কিলোমিটার সড়ক উদ্বোধনকালে এই ঘোষণা দেন। সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা ঘোষণা দেয়ায় বাংলা ভাষার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়।

সূত্র: প্রথম আলো

বিপ্লবী এক নারীর গল্প

ভাষা সৈনিক
মমতাজ বেগম

প্রায় ৬৬ বছর আগের কথা। তখন ভারতের কলিকাতার জজ ছিলেন রায় বাহাদুর মহিম চন্দ্র রায় চৌধুরী। তাঁর একমাত্র কন্যা কল্যাণী রায় চৌধুরী। এই কল্যাণী রায় চৌধুরীকে নিয়ে আমাদের আজকের লেখা।

কল্যাণী ভালোবেসে বিয়ে করেন গোপালগঞ্জের আবদুল মান্নাফকে। বিয়ের পরে তাঁর নাম হয় মমতাজ বেগম। সমস্ত অতীত পিছনে ফেলে স্বামী মান্নাফের সাথে তিনি চলে আসেন নারায়ণগঞ্জে। দু'জনে মিলে সেখানে তৈরি করেন সুখের সংসার। মর্গান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে চাকরি নেন তিনি। এর মধ্যেই কোল জুড়ে আসে একটি শিশুকন্যা। তার নাম রাখা হয় খুকু। সেই সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল।

মর্গান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন মমতাজ। হয়ে উঠলেন সবার কাছের মানুষ। এরপর এল সেই ১৯৫২ সাল। বাংলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাষা রক্ষার জন্য। ভাষার দাবিতে রাজধানী ঢাকায় তখন মিছিল আর মিছিল। ঢাকার পাশেই নারায়ণগঞ্জ। তাই ঢাকার মতো নারায়ণগঞ্জেও শুরু হয় আন্দোলন। মমতাজ বেগমও এই আন্দোলনের বাইরে থাকতে পারলেন না। তিনি তার স্কুলের তিনশত ছাত্রী নিয়ে নেমে গেলেন মিছিলে। পুরো নারায়ণগঞ্জে তখন তোলপাড়। মিছিলে মিছিলে সরগরম শহর।

প্রশাসনের নজর তখন মমতাজ বেগমের দিকে। তারা বুঝে গেছে আন্দোলন থামাতে হলে মমতাজ বেগমকে থামাতে হবে। ২২ ফেব্রুয়ারি নারায়নগঞ্জের 'চাষাঢ়া' মাঠে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সে সভায় যোগ দেন মমতাজ বেগম। সাথে মর্গান স্কুলের ৩০০ ছাত্রী ও শিক্ষক। ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হলো। বলা হলো, স্কুলের তহবিল আত্মসাৎ করেছেন মমতাজ বেগম।

২৯ তারিখ গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। তাঁর কন্যাটি তখন চার বছরের। স্কুলের চাকুরি থেকেও তাঁকে বাদ দেয়া হলো।

কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রীরা মানতে পারল না। মিছিল করে তারা কোর্টে হাজির হলো। কন্যাদের পাশাপাশি মায়েরা নেমে এলো সেই মিছিলে। এই মিছিল থামানোর ক্ষমতা রইল না কারো।

পুরো নারায়ণগঞ্জবাসীর মুখে তখন একটাই কথা- "মমতাজ আপাকে যে করেই হোক বের করতে হবে"। এই দাবীতে হাজার হাজার মানুষ ঘিরে ফেলল নারায়ণগঞ্জ থানা। সকাল নয়টা বাঁজতে না বাঁজতেই মানুষের ভীড়ে বন্ধ হয়ে গেলো রাস্তাঘাট। বন্ধ হয়ে গেলো স্কুল-কলেজ। বন্ধ হয়ে গেলো রান্না-বান্না।

সবাই হাজির থানায়। কিন্তু তাঁকে জামিন দিল না আদালত। ঢাকার কারাগারে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিল। রাগে ক্ষোভে ফেঁটে পড়লো মানুষ। সারা শহর জুড়ে শুরু হলো মানুষের জোর আন্দোলন। পুলিশের সাধ্য রইল না সেই আন্দোলন থামানোর।

চাঁষাঢ়া থেকে পাগলা পর্যন্ত ১৭০ টি গাছ কেটে রাস্তা বন্ধ করে দিল জনতা। কিছুতেই নিতে দিবে না তাদের আপাকে। এক পর্যায়ে শুরু হলো পুলিশের নির্মম অত্যাচার।

লাঠির আঘাতে রক্তাক্ত হলো হাজারো মানুষ। গ্রেফতার হলো ১২ বছরের বালক থেকে ৭২ বছরের বুড়ো। ভরে গেল থানা চত্বর। তবুও মানুষ কমল না রাস্তা থেকে। অবশেষে ডাকা হলো ইপিআর। রাতের অন্ধকারে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হলো মমতাজ আপাকে।

দুইদিন পরে ৪ বছরের খুকুকে নিয়ে দেখা করতে এলেন তাঁর স্বামী। এসে তাঁকে জানালেন মুক্তির উপায়। বললেন, স্বামীর কারণে তিনি এই সুযোগটি পাচ্ছেন। সেই সাথে তাঁকে শর্ত দেয়া হলো। বলা হলো, একটি কথা লিখে বণ্ডসই দিতে হবে। তাহলেই তাঁকে মুক্তি দেয়া হবে। লিখতে হবে, আর কোনদিন সে আন্দোলন করবে না। মমতাজ বেগম চুপচাপ শুনলেন স্বামীর সব কথা।

খুকুকে একটু আদর করলেন। তারপর বললেন, "আমি তা পারব না, আমার জন্য অনেক রক্ত ঝরিয়েছে নারায়ণগঞ্জের মানুষ। আমি সেই রক্তের সাথে বেঈমানী করতে পারব না। একরোখা স্বামী তাঁর কথা শুনে জানালেন- "তাহলে আমাদেরকে হারাতে হবে। "কয়েকদিন পরে মমতাজ বেগম পেলেন সেই নির্মম চিঠি। তাঁকে তালাক দিয়েছে তাঁর স্বামী। যাকে ভালোবেসে তিনি ছেড়েছিলেন ঘর। ছেড়েছিলেন ধর্ম ও নিজের দেশ।

১৯৫৩ সালের শেষদিকে দেড় বছর কারাভোগের পর জেল থেকে ছাড়া পেলেন তিনি। কিন্তু ফিরে গেলেন না আর নারায়ণগঞ্জে। ঢাকায় আনন্দময়ী গার্লস স্কুলে চাকুরি নিলেন। জেলের অত্যাচার তাঁর শরীর মন দুই-ই ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই একসময় অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। এই স্কুল থেকেও তাঁর চাকুরি চলে গেল। প্রচন্ড অর্থকষ্টে আর রোগ-শোকে ভুগতে লাগলেন তিনি। এক সময় তাঁর স্থান হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। ১৯৬৭ সালের কোনো একদিন চলে গেলেন তিনি। তাঁকে কবর দেয়া হলো আজিমপুর কবরস্থানে। কেউ জানল না কোন কবরটি তাঁর। হারিয়ে গেলেন মমতাজ বেগম কোন চিহ্ন না রেখেই।

দীর্ঘ ৬০ বছর পরে মানুষ জানল এই মহান ভাষা সৈনিকের কথা। তাঁর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া হলো। নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের সামনের সড়কটির নাম এখন 'ভাষাসৈনিক মমতাজ বেগম সড়ক'।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সবার পরিচিত,
তাঁর নামেতেই আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত।
আব্বার নাম মফিজউদ্দীন আম্মা আমিনা,
তাঁদের মুর্শিদ ইরানি পীর মোহাম্মদ আলী শা'।
আঠারশ' তেয়াত্তর সাল ডিসেম্বরের প্রাতে,
জন্ম তাঁর নলতা গ্রামে, জেলা সাতক্ষীরাতে।

ম্যাট্রিক এবং আইএ বিএ কলকাতাতেই সব,
প্রতিটিতেই কৃতিত্ব মেধা অসম্ভব।
অবশেষে দর্শন বিষয় এমএ পাশের শেষে,
হেডমাস্টার হলেন তিনি রাজশাহীতে এসে।
সর্বশেষে সম্মানিত শিক্ষা বিভাগের,
সহকারী পরিচালক বাংলা-আসামের।

ঊনিশ শ' ঊনত্রিশ সালে অবসর যে নিয়ে,
জীবন-যাপন করলেন শুরু নলতা গ্রামে গিয়ে।
ধর্মজীবন কর্মসেবায় জীবন ভরা তাঁর,
খানবাহাদুর উপাধি তাই পেলেন পুরস্কার।
তাঁরই সেবার সূত্র ধরে আহ্ছানিয়া মিশন চলে,
বাংলা ছাড়াও বিশ্বমাঝে সেবার প্রদীপ জ্বলে।

ঊনিশ শ' পঁয়ষট্টির নয়-ই ফেব্রুয়ারি,
বাংলা হলো ছাব্বিশে মাঘ ইন্তেকালের দিন তাঁরই।

একুশে ফেব্রুয়ারি

নাছিমা শাহীন

আবার আসিল ফিরে
একটি বছর পরে
একুশে ফেব্রুয়ারি,
শহীদদের স্বরণে
ফুলের মালায় বরণে
করব প্রভাতফেরী।

লাখো শহীদের রক্তে
দিনটি গড়েছে শক্তে
ভেঙেছি উর্দুর ডাঙাবেরী।
এনেছি ভাষা বাংলা
করব না তারে অবহেলা
ভিনদেশে ভাসাব তার তরী।

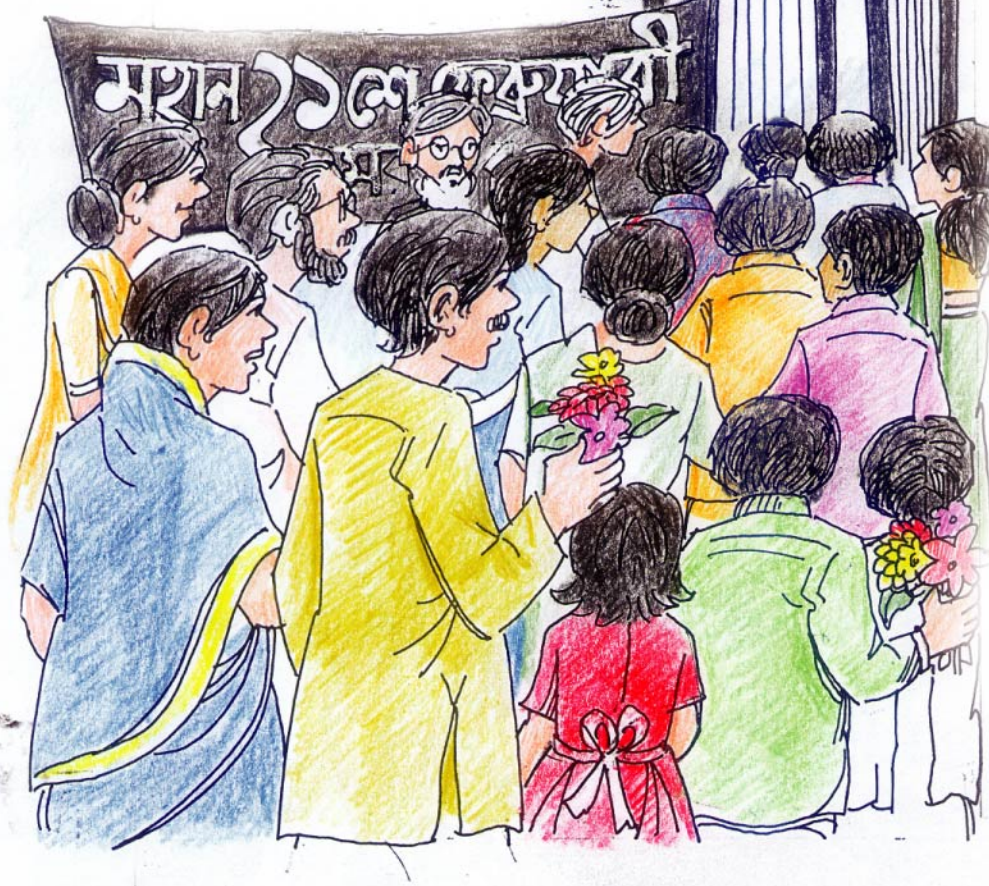

কৃষ্ণচূড়ায় ভায়ের স্মৃতি

মোঃ জাহিদুর রহমান খান

কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে
ভরে আছে ডাল,
আমার ভায়ের বুকের রক্তে
হলো সে যে লাল।
'ও ফুল তুই আর ফুটিস না
বুক ভেঙে যায় মোর।
চোখের সামনে ফুটে ওঠে
একুশের ঐ ভোর।'
'ও বোন তুই দিস না বাঁধা
মিছিলে যেতে দে,
রুখব তাদের আমার মায়ের
ভাষা কেড়ে নেয় যে।'
এই যে ছিল আমার ভায়ের
শেষ কথাটি হায়,
আমার ভায়ের শেষ কথাতে
ভাষা জীবন পায়।

গাউতা

জলাবদ্ধ এলাকায় চাষাবাদের কৌশল

'গাউতা' হচ্ছে ভাসমান পদ্ধতিতে চাষাবাদের একটি স্থানীয় কৌশল। স্থানীয়ভাবে একে ধাপও বলে। জলাবদ্ধ এলাকায় ফসল চাষ করার জন্য 'গাউতা' তৈরি করা হয়।

'গাউতা' পদ্ধতিতে চাষের উপকারিতা

- 'গাউতা' পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি চাষাবাদ করা যায়। ফলে জলাবদ্ধ এলাকায় পুষ্টি চাহিদা মেটানো যায়।
- কৃষক ইচ্ছা করলে তার 'গাউতা' ভাসিয়ে অন্য কোথাও নিতে পারে।
- পানি শুকিয়ে গেলে 'গাউতা' কম্পোস্ট সার হিসেবে জমিতে ব্যবহার করা যায়।
- এই সার ব্যবহার করলে অন্য কোনো রাসায়নিক সার প্রয়োজন হয় না।

যেসব সবজি চাষ করা যায়

একটি গাউতায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করা যায়। কিছু কিছু শাক-সবজি সারা বছরই উৎপাদিত হয়। বর্ষাকালে ফসলকে পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। আবার যখন বিলের পানি বেড়ে যায় তখনও কিছু সবজি এই পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। যেমন- শশা, ঢেড়ঁস, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, হলুদ, বরবটি, কুমড়া, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, উচ্ছে, করলা, লালশাক, পুঁইশাক এবং পানি কচু ইত্যাদি।

আবার শীতকালেও কিছু ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। যেমন- লাউ, বরবটি, মূলা,সীম, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, বাঁধাকপি, শশা, ফুলকপি ইত্যাদি।

উপকরণ

'গাউতা' পদ্ধতিতে চাষের প্রধান উপকরণ হচ্ছে কচুরিপানা। পুকুর, নদী, খাল অথবা জলাভূমিতে কচুরিপানা পাওয়া যায়। মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে এই উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়।

গাউতা পদ্ধতিতে চাষাবাদের কৌশল

এই পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রথমে ধাপ তৈরি করতে হয়। ধাপ তৈরির জন্য পানির গভীরতা বড় বিষয় নয়। পানির যে কোনো গভীরতায় ধাপ তৈরি করা যায়।

যেভাবে ধাপ তৈরি করতে হয়

- প্রথমে লম্বা একটা বাঁশ কচুরিপানার মধ্যে ফেলে দিতে হয়।
- এরপর ঐ বাঁশের চারপাশ থেকে কচুরিপানা টেনে এনে জড়ো করতে হবে।
- যতক্ষণ পর্যন্ত পছন্দমতো উচ্চতা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কাজ করতে হবে।
- ৭ থেকে ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর প্রথম স্তরের উপর আবার কচুরিপানা বিছাতে হবে। এভাবে কয়েক স্তরে ধাপ তৈরি করতে হবে।
- ধাপের উপরের দিকে সাধারণত সমতল রাখা হয়। উপরের স্তরে কিছু পরিমাণ মাটি দিতে হবে।
- ধান গাছের এই গোঁড়ার উপর ধাপ তৈরি করা যায়। এক্ষেত্রে দুই স্তর করে কচুরীপানা রাখতে হয়।
- ধাপের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে নিজের ইচ্ছার উপর। তবে ধাপ বেশি বড় না হওয়াই ভালো। কারণ ভাসমান ধাপের উপর বসে কাজ করা ঠিক না। যত্নের সুবিধার জন্য ধাপ বেশি চওড়া না হওয়াই ভালো।
- ভাসমান ধাপগুলো সাধারণত ১০ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

যেসব বিষয় জানা দরকার

- আগে থেকে ধানের গোঁড়া সংগ্রহ করলে ধাপ তৈরি করতে সুবিধা হয়। এসব শুকনো কোনো জায়গায় সারি দিয়ে দিয়ে রাখতে হয়।
- আমন ধান কাটার পর গাছের গোঁড়া সংগ্রহ করতে হয়। তা না হলে পরে এক সময় তা পচে যায়।
- দীঘা ধানের খড়ের উপরও গাউতা তৈরি করা যায়। এই ধানের খড় খুব লম্বা হয় এবং সহজে পচে নষ্ট হয় না।
- বর্ষাকালে ধান গাছের গোঁড়াগুলো পানিতে ভেসে উঠে। স্থানীয় ভাষায় একে জেটো বলে। ভেসে ওঠা এই খড়ের উপরও গাউতা তৈরি করা যায়।

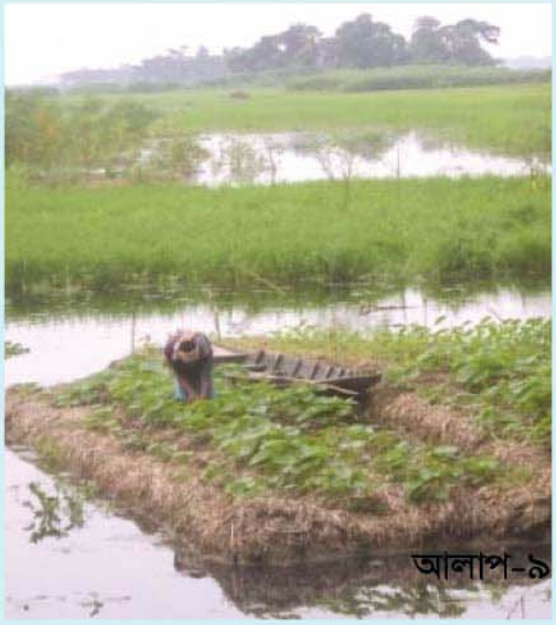

আমার সেই গ্রাম

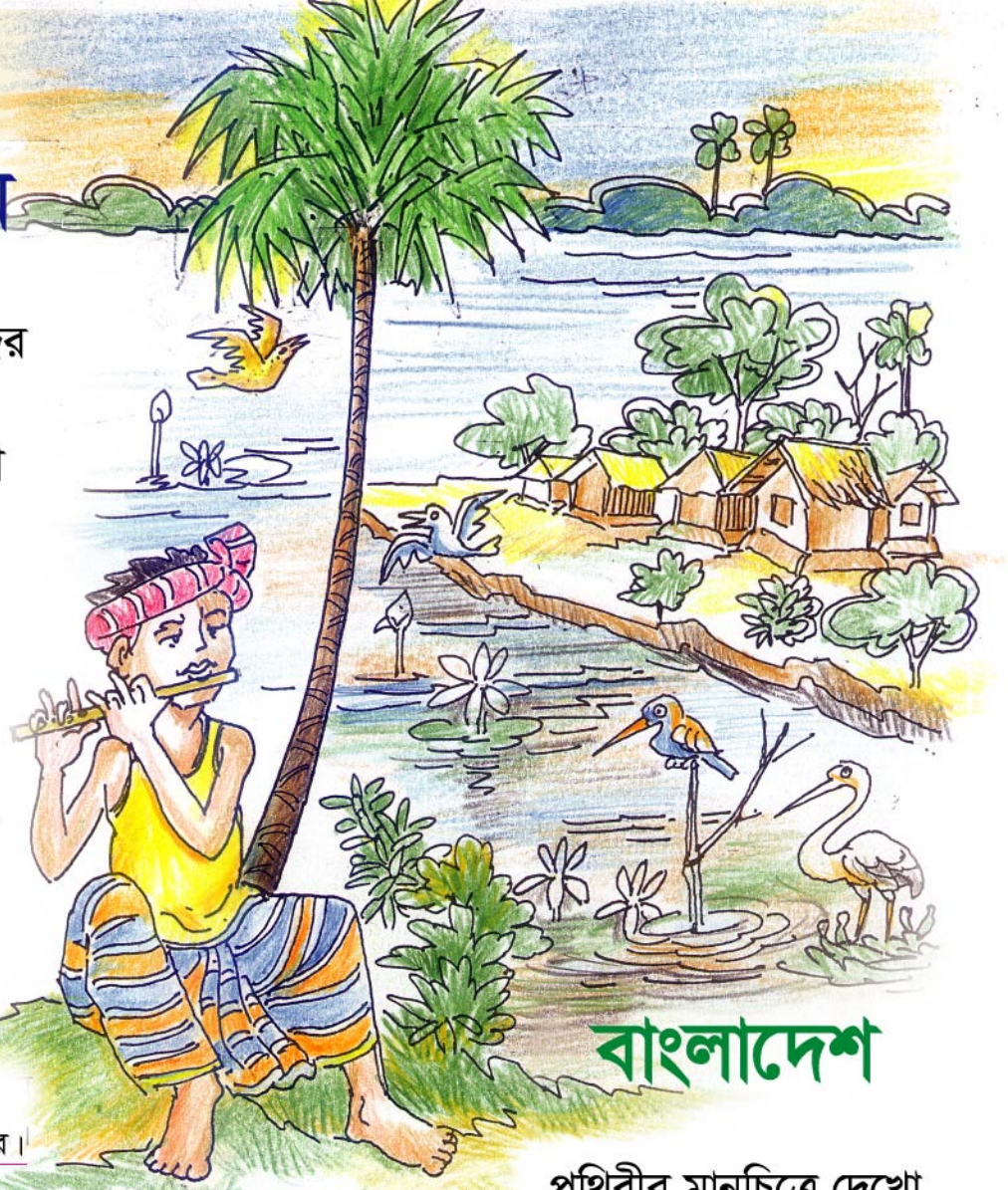

সবুজ শ্যামল গ্রামটি মোদের
তাকিয়ে দেখো দূরে
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি
মন মেতে রয় সুরে।
শাপলা ফুল ফুটে থাকে
উজানতলির বিলে
বাদল দিনে ইচ্ছে করে
সাঁতরে বেড়াই ঝিলে।
ধুসর শ্যামল পাহাড়খানি
নিত্য আমায় ডাকে
ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই
শান্ত নদীর বাঁকে।

ফাতেমা বেগম
প্রতিক্ষা গণকেন্দ্র, কেশবপুর, যশোর।

বাংলাদেশ

পৃথিবীর মানচিত্রে দেখো
ছোট্ট একটি দেশ
সে আমার এই জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ।
ছোট থেকে বড় হলাম
দেশের মাটির ঘ্রাণে
দেশের জন্য সকল কাজ
করব সতেজ প্রাণে।
ধন্য আমি জন্ম নিয়ে
এই বাংলার বুকে
বাংলা ভাষা থাকে যেনো
চিরদিন মোর মুখে।

আল্পনা দাশ
নবগঙ্গা গণকেন্দ্র, ঝিনাইদহ।

খোদার দান

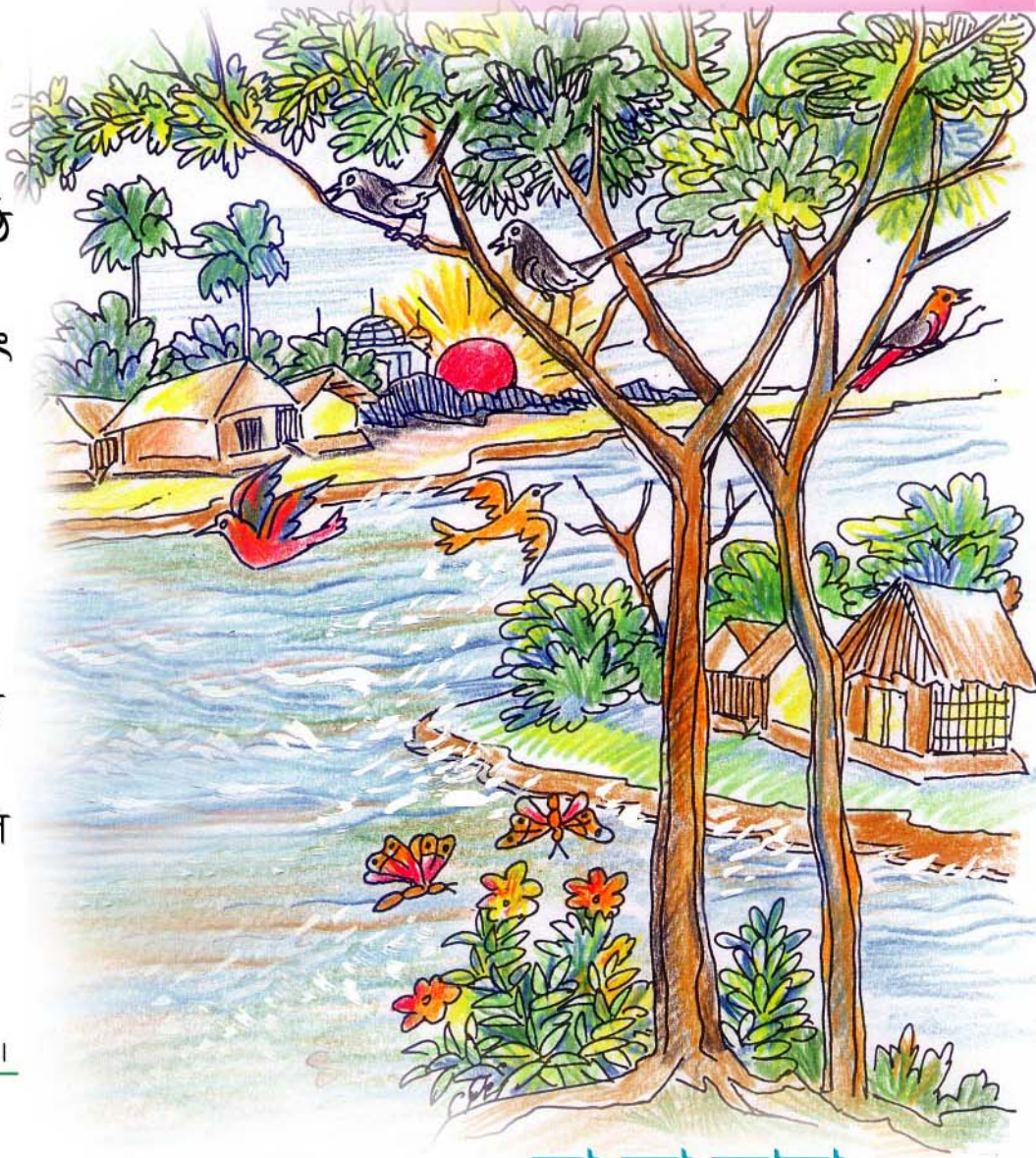

বিহান বেলা পাখির কণ্ঠে
মধুর মধুর গান,
ভেসে আসে ছলাৎ ছলাৎ
নদীর কলতান।
পুব গগনে সূর্য্যি মামা
হেসে হেসে ওঠে
প্রজাপতি সুবাস নিতে
ফুল বাগানে ছোটে।
বিশ্বমাঝে এদেশ আমার
খোদার সেরা দান।
মায়ের ভাষায় কথা বলি
রাখব ভাষার মান।

সুইট সুলতানা
প্রদীপ গণকেন্দ্র, কেশবপুর, যশোর।

বাংলা ভাষা

বাংলা আমার জন্মভূমি
বাংলা আমার আশা,
বাংলা আমার মায়ের মুখের
মধুর মধুর ভাষা।
বাংলাভাষার বর্ণগুলো
মায়ের কাছে জানি
বাংলাভাষা তাইতো আমার
প্রাণের চেয়ে দামি।

মোছাঃ রেখা খাতুন
আশার আলো গণকেন্দ্র,হাকিমপুর

জিডি বা সাধারণ ডায়েরি

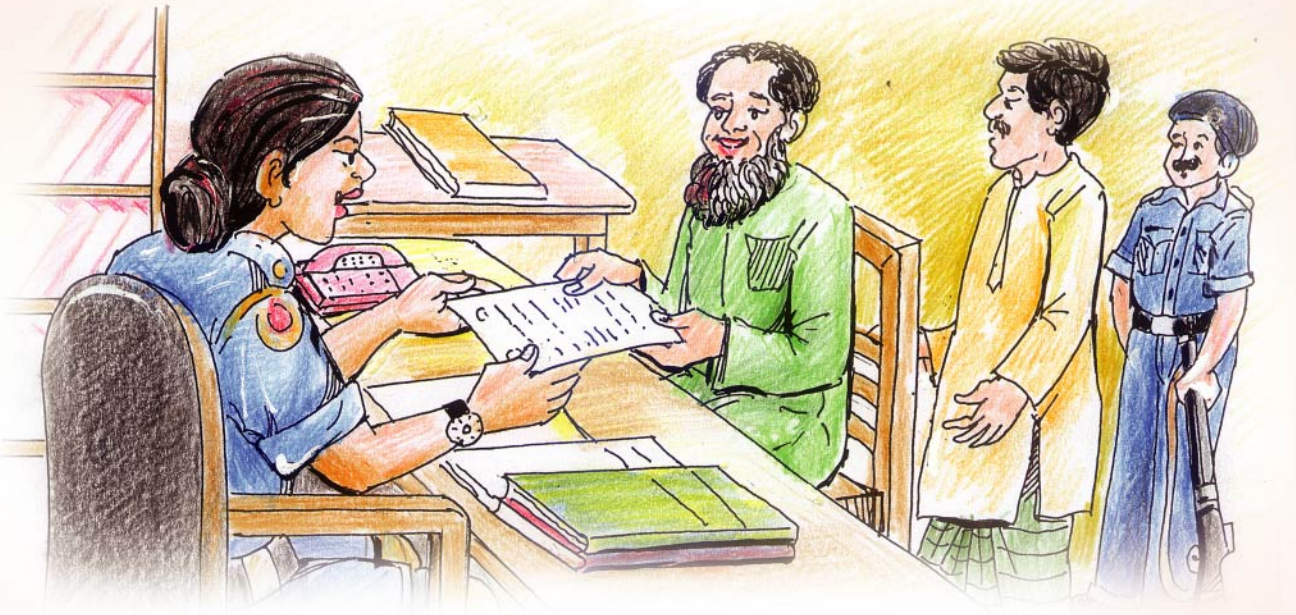

'জিডি' একটি পরিচিত শব্দ। কিন্তু আমরা অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার জানি না। অনেক সমস্যা আছে, যা নিজে বা সহজে সমাধান করা যায় না। তখন আইনি সহায়তার প্রয়োজন হয়। আর তখনই থানায় 'জিডি' বা 'সাধারণ ডায়েরি' করার দরকার হয়। 'জিডি' করা মানে কোনো মামলা নয়।

জিডি বা জেনারেল ডায়েরি কী

'জিডি' হলো আইন সহায়তাকারী সংস্থার সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রথম ব্যবস্থা নেয়া। যাকে 'জেনারেল ডায়েরি' বা সংক্ষেপে 'জিডি' বলা হয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের আইনি সহায়তা দরকার, সে বিষয়ের সাধারণ বিবরণ। দরখাস্ত আকারে থানায় যা জমা দিতে হয়।

কেন জিডি করবেন

যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যেকোনো অপরাধের জন্য থানায় 'জিডি' করতে পারেন। তাছাড়া মূল্যবান কোনো জিনিস হারালেও 'জিডি' করা যায়। যেমন- সার্টিফিকেট, দলিল, লাইসেন্স, পাসপোর্ট, মূল্যবান রশিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, চেকবই, এটিএম বা ক্রেডিট কার্ড, টাকা-পয়সা, সোনার গহনা ইত্যাদি। এছাড়া কোনো প্রকার হুমকি পেলে বা হুমকির আশংকা থাকলেও 'জিডি' করা যায়। আবার কেউ নিখোঁজ হলেও 'জিডি' করার সুযোগ রয়েছে।

কোথায় করবেন

জিনিস হারানোর ক্ষেত্রে যে এলাকায় জিনিস হারিয়েছে, সে এলাকার থানায় জিডি করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে সবসময় ঘটনাস্থলকে বিবেচনায় নিতে হবে। অন্য সব ক্ষেত্রে নিজ এলাকার থানায় জিডি করা ভালো।

জানা জরুরি

মনে রাখবেন, 'জিডি' করতে কোনো টাকা-পয়সা লাগে না। 'জিডি' করলে দুটি কপি করতে হয়। আবেদনের একটি কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ এবং অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল লাগিয়ে দেয়া হয়। সেইসাথে জিডিটি নথিভুক্ত করা হয়। সিলযুক্ত এই কপিটি নিজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

যদি লিখতে না পারেন, থানার সেবা প্রদান কর্মকর্তা প্রয়োজনে তা লিখে দিবেন। এক্ষেত্রে শুধু নিচে স্বাক্ষর করলেই চলে।

দরখাস্তে যা থাকবে

অনেকেই 'জিডি' কীভাবে লিখতে হয়, তা জানেন না। এটা ঠিক অন্যান্য দরখাস্তের মতোই লিখতে হয়। নিচে 'জিডি'র একটি নমুনা দেয়া হলো।

জিডির নমুনা

বরাবর
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
দুমকি থানা, পটুয়াখালী।

বিষয়ঃ সাধারণ ডায়েরী করার জন্যে আবেদন।

জনাব,

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী মোঃ আবুল হোসেন, বয়স ৪৮ বছর। পিতা: আকরাম হোসেন, ঠিকানা: গ্রাম: মুরাদনগর, ডাক: মুরাদিয়া, থানা: দুমকী, জেলা: পটুয়াখালী।

এই মর্মে জানাচ্ছি যে, আজ ২ মার্চ ২০২২ ইং সকাল ১০ টায় দুমকী সদর হাসপাতাল এলাকা থেকে আমার জাতীয় পরিচয়পত্র ও ১টি জমির দলিল হারিয়ে গেছে বিষয়টি থানায় অবগতির জন্য সাধারণ ডায়েরীভুক্ত করার অনুরোধ করছি।

নিবেদক
মোঃ আবুল হোসেন
তাং- ২ মার্চ ২০২২

ধাঁধা

একজন ছেলে, একজন মেয়ে বসে আছে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হলো- 'ছেলেটার সাথে আপনার সম্পর্ক কি?

মেয়েটা হেসে উত্তর দিল- আমার শ্বশুর হয় তার শ্বশুরের বাপ।'

এবার বলেন দেখি, তাদের সম্পর্ক কি?

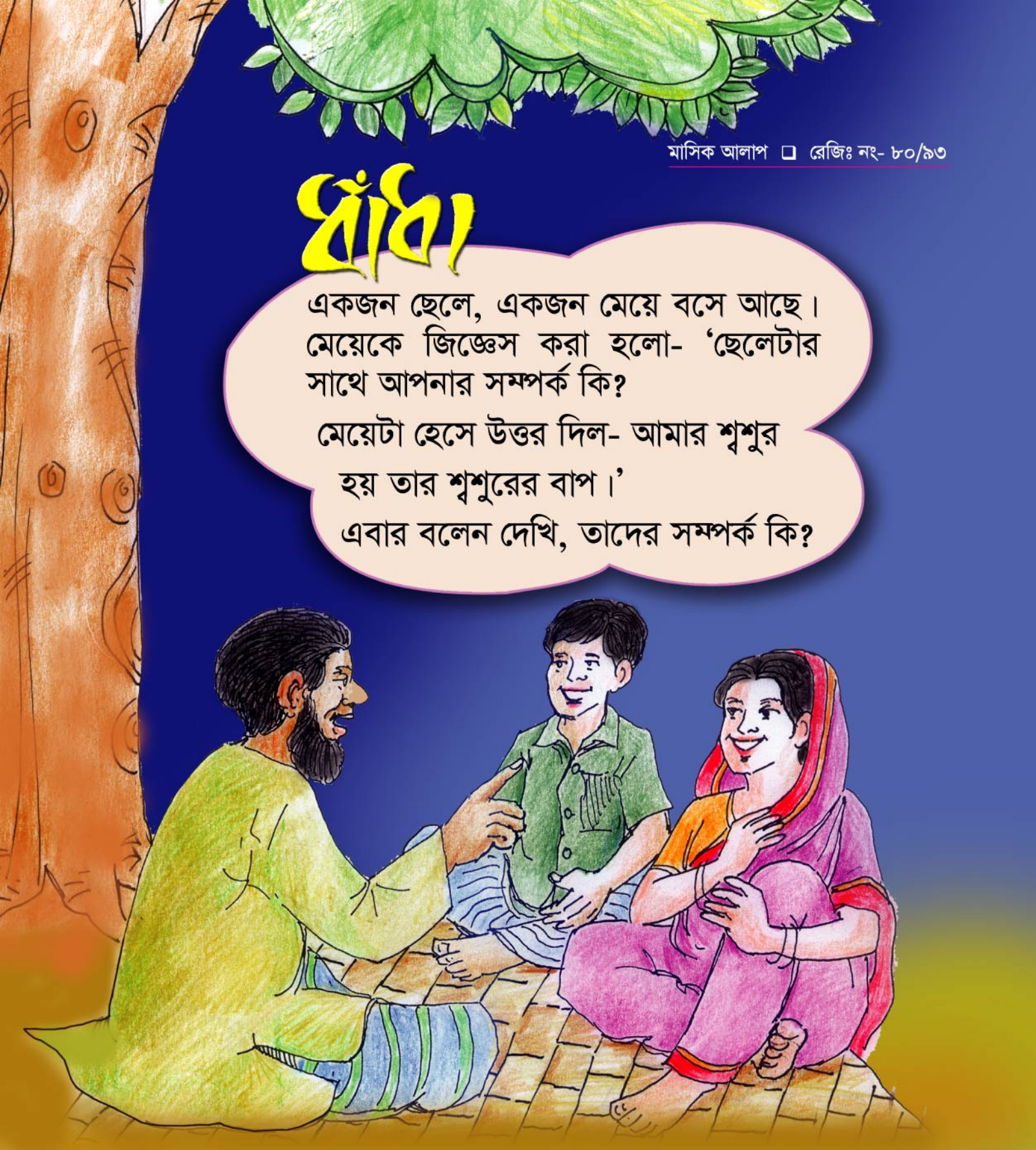

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission